সম্পাদকের বক্তব্য

উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের বাংলা গবেষণা মুখপত্র *'প্রবন্ধাবলী'*–এর বর্তমান সংখ্যা বেশ একটু সময় নিয়েই বের হচ্ছে। এর কারণ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রের সকল প্রকাশনা সম্পর্কিত কাউন্সিল ও সম্পাদনা পরিষদের প্রণীত নতুন নীতিমালা বাস্তবায়ন। এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত মান অনুযায়ী এর প্রকাশনা সুনিশ্চিত করা। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী প্রবন্ধাবলীর সংশোধন, পরিমার্জন ও মানোন্নয়ন প্রভৃতি সময় সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডে সম্মানিত শিক্ষক–গবেষকদের আশানুরূপ সাড়ার অভাব। স্পষ্টতই বাংলা বা ইংরেজীতে প্রকাশিতব্য যে–কোনো পত্র–পত্রিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধ না হলে ভাব বা ধারণার সমন্বয় ঘটানো কঠিন হয়। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *'প্রবন্ধাবলী'*–এর বর্তমান সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা আনন্দিত।

'প্রবন্ধাবলী'–এর বর্তমান সংখ্যায় সর্বমোট ছয়টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধে বিশেষ একটি ধারণাগত ভাব উপস্থাপিত হয়ঃ প্রথমটিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়টিতে ইতিহাস সম্পর্কিত নৈতিক চেতনা, তৃতীয়টিতে রাজনৈতিক অর্থনীতি, চতুর্থটিতে সাংবিধানিকতা ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ, পঞ্চমটিতে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও উপজাতীয়–জাতীয়তাবাদ এবং সর্বশেষটিতে উপর্জাতীয় সম্পর্ক ও জাতীয় স্বার্থের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিটি প্রবন্ধই বাংলাদেশের কোনো না কোনো প্রসঙ্গে লেখা – সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতি–রাষ্ট্র ও উপর্জাতীয় লেনদেন। প্রতিটি বিষয় বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্ববহ।

কৃষক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ–বিরোধিতা সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে লেখক তদানীন্তন (ভারত বিভাগ উত্তরকালীন) পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রের স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হন। সমস্যা জর্জরিত তৎকালীন পূর্ব বাংলার কৃষকরা সংস্কারমুখী কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে চায় তাদের ভূমি ও খাজনা প্রশ্নের সমাধান, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী রাষ্ট্রের প্রত্যুত্তর ছিল চিরাচরিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মতই

– সনাতনপন্থী, পশ্চাদমুখী, স্বৈরাচারী ও হীন সাম্প্রদায়িক। ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বের সমাধান তো হয়ই নি, বরং কালে সামাজিক সমস্যা ক্রমান্বয়ে সংকটের রূপ পরিগ্রহ করে, শাসক গোষ্ঠীর বাগধারা ও ভাষা গোটা দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে। এ ধরনের আরো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সম্ভবত গবেষক এবং নীতি নির্ধারক নির্বিশেষে সবার চিন্তাধারাকে আরো প্রখর ও ক্ষুরধার করবে।

"মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা" শীর্ষক সমালোচনাধর্মী দ্বিতীয় প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ/মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ হারিয়ে যাওয়া এবং সার্বিকভাবে সেই যুদ্ধের বিলুপ্তপ্রায় চেতনা সম্পর্কে লেখকের উৎকণ্ঠার পরিচয় মেলে। ইতিহাসের নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসাবে লেখক অবশ্যই জোর দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের এমন এক স্থানীয় পর্যায়ের ইতিহাস রচনার ওপর যা হবে বিজ্ঞানসম্মত, তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। তাঁর প্রত্যাশা, এর ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস। প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ পরিসরে লেখক তাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত লেখালেখির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করেছেন, তুলে ধরেছেন এর সম্ভাবনাময় দিক। এজন্য তিনি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখাও প্রণয়ন করেছেন, বলেছেন সরকারী অনুদান ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা।

বলা প্রাসঙ্গিক যে, আমাদের মতো অনুন্নত দেশে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া জ্ঞান অনুশীলন ও জ্ঞান বিতরণের কাজ নিতান্তই কঠিন। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস রচিত হলে তাতে বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী। তাছাড়া, সমকালীন ইতিহাস সর্বদাই হয় সমকালীন রাজনীতির প্রভাব দোষে দুষ্ট। কেননা, সবযুগের মানুষই তাদের নিজস্ব ইতিহাস লিখে থাকে নিজেদের চিন্তা–চেতনা অনুযায়ী, যা হতে পারে আপন স্বার্থ–সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা সম্ভবত ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি–মানুষ বা গবেষণা সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিবেচিত হতে পারে সমাজ বিজ্ঞানের একটি ধারা হিসাবে। মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে এদেশের আন্দোলনে উদ্বেলিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রকৃত নীতি, রণনীতি ও রণকৌশল উদঘাটন বা তাদের পেছনে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব চালিকা শক্তি হিসেবে ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের রণনৈতিক কৌশলাদি উদ্দেশ্যাবলী যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণী কাঠামোর ব্যবহার সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বি আই ডি এস–এর মতো আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্ক্রিয় 'আরকাইভস ও ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র' কে যথাশীঘ্র সম্ভব সক্রিয় বা তৎপর করা সমীচীন হবে। তবে ইতিহাস–বিমুখ একটি জাতিকে তাদের অবলুপ্ত চেতনায় জাগিয়ে তুলতে লেখক যে দিক–নির্দেশনা দিতে প্রয়াসী তা সুচিন্তিত ভাবনার খোরাক যোগাবে অবশ্যই।

রাজনীতি–অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাংলাদেশের বন্যা' সম্পর্কে লেখা তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক বন্যা সম্পর্কিত চিরাচরিত প্রসঙ্গ ছাড়া কিছুটা ভিন্নতর, অথচ যৌক্তিক, প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। বিগত দশকে উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার পর একটি সাধারণ বিষয় বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত তাহলো – বন্যার সঙ্গে সহাবস্থান। তাই বন্যা প্রশ্নটিকে নিছক পানি নিয়ন্ত্রণ বা পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রসঙ্গ হিসেবে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে দেশে ভূমি–ব্যবহার ও কৃষি উন্নয়নের দিক, দেখতে হবে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো। এজন্যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বন্যাকে মূলধন করে যাতে স্বার্থান্বেষী মুনাফাখোরেরা তাদের শ্রেণীর স্বার্থে বিশেষ ফায়দা যেমন লুটতে না পারে সেদিক দেখতে হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো তাদের প্রতিবেদন বা পরিকল্পনা বাংলাদেশের ওপর ইচ্ছামাফিক চাপিয়ে না দিতে পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই এটা বলা অমূলক নয় যে, বন্যার সঙ্গে সহ–অবস্থানের অর্থই হচ্ছে বন্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল বিষয় সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থেকে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সনের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রসঙ্গ অবতারণা করে চতুর্থ প্রবন্ধে সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্রের বৃহত্তর ও জটিল বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা ও ব্যাপক বিতর্কের সূচনা করা হয়েছে। ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী নিয়ে গণরোষ বা বিস্ফোরণমুখী জনবিক্ষোভ বহুদিনের। এ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিষোদগারেরও অন্ত নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে অভাব রয়েছে বিকল্প সুচিন্তিত রূপরেখার ও স্বচ্ছ চিন্তার এবং সম্ভবত অভাব রয়েছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চর্চা ও সুস্থ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু করার ব্যাপারে যথার্থ আন্তরিকতার। তাই লেখক শাণিত ভাষায় স্বাধীনতা–উত্তরকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচন করতে প্রয়াসী হন। প্রকৃতপক্ষে দেশকে সাংবিধানিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে হলে এবং একে যথার্থ–ই গণতন্ত্রে উত্তরণে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের রাজনীতির বিশ্লেষণে আরো চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষকে যুক্তিপূর্ণ ভাষা, ভাব ও অন্তঃদৃষ্টি সহকারে এগিয়ে আসতে হবে।

সমকালীন বিশ্বে উপজাতীয় সমস্যা বেশ জটিল সমস্যা রূপে পরিচালিত। ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য বহুদেশের তুলনায় অনেকটা সমরূপা দেশ বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই উপজাতীয় সমস্যামুক্ত নয়। পঞ্চম প্রবন্ধে বাংলাদেশের এই উপজাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্যাকে লেখক দেখেছেন "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা" হিসাবে। স্বাভাবিকভাবেই এ জাতীয় অন্যান্য সমস্যার মতো এ সমস্যারও রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি, রয়েছে এর বিভিন্ন পর্যায়, বিশেষ করে রয়েছে আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী উপজাতীয়দের রাজনৈতিক

আন্দোলনের রূপ ও এর স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। প্রবন্ধে এসব স্থান পেয়েছে। সমস্যার সমাধানকল্পে লেখক জোর দিয়ে বলেছেন সনাতন আমলাতান্ত্রিক দলন ও দমননীতি পরিহার করার কথা, জোর দিয়েছেন রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর যাতে ঐ অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে, সুগম হয় রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পথ। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের অন্যত্র উপজাতীয় সমস্যার সমাধানেও একই পথ নির্দেশনার পরিচয় মিলবে।

সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানী/করপোরেশনের পুঁজি ও প্রযুক্তি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক মহা প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ক্রমান্বয়ে আজকাল এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ বহুজাতিক কোম্পানীসমূহকে নিয়ে অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিতর্কের উর্ধে নয়। *'প্রবন্ধাবলী'র* শেষ প্রবন্ধে সেই বিতর্কের দিকটা উপস্থাপিত হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের জটিলতা এবং আলোচ্য বিষয়ে উপাত্তের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে প্রবন্ধের বক্তব্য ও বিশ্লেষণ কতখানি তথ্য নির্ভর হয়েছে তা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশ প্রকৃত অর্থে কতখানি বুহজাতিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগ থেকে লাভবান হচ্ছে তা সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখা দরকার, কেননা যে, কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের দিকটা সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে জাতীয় সরকারের দায়িত্ব। অন্ততঃপক্ষে লেখকদ্বয় অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সেই চেষ্টাই করতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে মনে হয়।

'প্রবন্ধাবলী'তে অর্ন্তভুক্ত প্রবন্ধসমূহে লেখকদের মৌলিক গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলবে বলে আমার বিশ্বাস। সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধটি ছাড়া বাদবাকী সকল প্রবন্ধই কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বিশেষভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। সাংবিধানিকতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে তা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু সকল প্রবন্ধই বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকমন্ডলীর মতামত অনুসারে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রবন্ধে একটি সার-সংক্ষেপ সংযোজিত হয়েছে এবং তথ্য-নির্দেশের ক্ষেত্রে মোটামোটি সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি কেন্দ্রের পরিচালক ও সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে ১৯৭৪ সনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রের নতুন কাউন্সিল ও সম্পাদনা পরিষদ একটি উচ্চতর গবেষণা সংস্থার কাঙ্ক্ষিত মান অনুসারে জ্ঞানগর্ভ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে বেশ কিছু নতুন নীতি প্রবর্তন করে। এসব নীতি ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষদ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার সহকর্মীবৃন্দ যে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেছেন আমি তার জন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

এক্ষেত্রে সম্পাদক স্বয়ং একক কৃতিত্বের দাবিদার নন, কেননা এই কৃতিত্বের অংশভাগী হচ্ছে কেন্দ্রের এই মুখপত্র ও এর সঙ্গে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়। এর সর্বোর্ধ্বে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ং, যিনি কেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে এর কর্মকান্ডে সতত আগ্রহ প্রদর্শন করেন ও প্রেরণা যোগান। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন মহোদয়ও সর্বদাই ছিলেন আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গী। এ ছাড়া কাউন্সিল এবং সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গও কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণ ও প্রকাশনার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে আমাদের উৎসাহ প্রদান করেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে যাঁরা এগুলো আলোচনা-সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর কে এম মোহসীন, প্রফেসর আইয়ুবুর রহমান ভুঁইয়া, প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, ড· ডালেম চন্দ্র বর্মন, ড· নজরুল ইসলাম, ড· হারুন-অর-রশিদ, ড· রতন লাল চক্রবর্তী, ড· সৈয়দ রাশেদুল হাসান, ড· ইমতিয়াজ আহমেদ ও জনাব রশীদ হায়দার। এসব নির্ধারিত আলোচক ছাড়াও আরো অনেক বিদগ্ধ সহকর্মী এবং সুধী কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারসমূহে স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাদের উৎসাহিত করেন।

কেন্দ্রের কর্মকান্ড পরিচালনা এবং এই বাংলা মুখপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগে সাহায্য-সমর্থন প্রদানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং সম্পাদনা পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সকল শিক্ষকের নিকট ঋণী। উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সকল কর্মকান্ড ও সাফল্যের কৃতিত্ব উপরিউক্ত সকলের, কিন্তু এক্ষেত্রে *প্রবন্ধাবলী'র* সম্পাদক ও কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে সব ব্যর্থতা ও ভুল-ত্রুটির দায়-দায়িত্ব একমাত্র আমার।

আবুল কালাম
সম্পাদক
এবং
পরিচালক, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩ আগস্ট ১৯৯২